



আল-কোরআনের শাব্দিক পরিচয় :

কোরআনের শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে:

১। ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলেমের মতে-'কুরআন' হল নির্ধারিত নাম। এটা এসমে মুশতাক বা অনির্ধারিত নাম নয়। তাঁরা বলেন এটা কালামুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন ইঞ্জিল, তাওরাত, যবুর বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপ সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থের নাম হল কুরআন; আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

"বরং এটা মহান কোরআন লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।" (বুরূজ ২১-২২)

২। আরেক দল আলেম বলেন, 'কুরআন' শব্দটি অনির্দিষ্ট নাম। যার অর্থ মিলিত অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে মিলিত তাই এটাকে 'কুরআন' বলা হয়।

৩। কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, 'কুরআন' শব্দটি 'ক্বারউন' হতে নির্গত। এসমে মাফউল থেকে এর অর্থ হবে পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই কুরআন বলা হয় যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ।

৪। অনেকে বলেছেন, 'কুরআন' শব্দটির অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদানুযায়ী আমলকারীকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়। তাই কুরআনকে 'কুরআন' নামকরন করা হয়েছে।

৫। ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ.) বলেছেন 'কুরআন' এর অর্থ হল একত্র করা, জমা করা। কোন বিষয় অধ্যয়ন ও পাঠ করার জন্যে প্রচুর অক্ষর এবং শব্দসম্ভার একত্র করতে হয়; এই নূন্যতম সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে 'কুরআন' শব্দটি অধ্যয়ন করা , পাঠ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আল-কুরআনের পারিভাষিক পরিচয় :

১। নুরুল আনোয়ার গ্রন্থকার বলেন-কুরআন হল রাসুল [সা.] এর উপর অবতারিত, যা সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে, যা রাসুল [সা.] থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে উদ্ভূত হয়ে এসেছে।

২। মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে-কুরআন হল মহান আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নাম ‘আল কুরআন’ (আল মুজামুল ওয়াসীত ও মায়ারিফুল কোরআন, বাংলা, মাওলানা মুহীউদ্দীন আহমেদ)

৩। আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান [রহ.] বলেন- কুরআন হল এমন এক আসমানী কিতাব যা আমাদের মহান নেতা মুহাম্মাদ [সা.] এর উপর অবতীর্ণ, যার একটি সূরার মোকাবিলায় মানুষ অক্ষম

কুরআনের বৈশিষ্ট্য

কুরআনের দাবি সে আল্লাহরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং এতে কোনও সন্দেহ নেই। কুরআন তাঁর এ দাবির সত্যতা নানাভাবে প্রমাণ করেছে। কুরআন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

তবে কি তারা বলে, সে (নবী) নিজের পক্ষ থেকে এই ওহী রচনা করেছে? (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে তোমরাও এর মত দশটি স্বরচিত সূরা এনে উপস্থিত কর এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হূদ ১৩০)

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন উম্মী নবী। তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তোমরা তো অনেক লেখাপড়া জান। আরবী সাহিত্যে তোমাদের প্রচুর দখল ও দক্ষতা। তা এ কিতাব যদি তার মত একজন নিরক্ষর লোক রচনা করতে পারেন, তবে তোমাদের মত উঁচু মানের কবি-সাহিত্যিকগণ কেন পারবে না! সুতরাং তোমরা এর মত পূর্ণাঙ্গ কিতাব নয়; বরং এর মত দশটা সূরাই তৈরি করে দেখাও না!

পূর্ববর্তী সময়ে এ চ্যালেঞ্জ আরও সহজ করে দেওয়া হয়। সূরা বাকারায় ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

তোমরা যদি এই (কুরআন) সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাক, যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি নাযিল করেছি, তবে তোমরা এর মত কোনও একটি সূরা বানিয়ে আন। আর সত্যবাদী হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও। তারপরও যদি তোমরা এ কাজ করতে না পার আর এটা তো নিশ্চিত যে, তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা বাকার (২) : ২৩-২৪)

সূরা ইউনুসে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

এ কুরআন এমন নয় যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে রচনা করা হবে, বরং এটা (ওহীর) সেইসব বিষয়ের সমর্থন করে, যা এর পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ (লওহে মাহফুজে) যেসব বিষয় লিখে রেখেছেন এটা তার ব্যাখ্যা করে। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। তারপরও কি তারা বলে, রাসূল নিজের পক্ষ হতে এটা রচনা করেছে? বল, তবে তোমরা এর মত একটি সূরাই (রচনা করে) নিয়ে এসো এবং (এ কাজে সাহায্য গ্রহণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা ইউনুস ৩৭-৩৮)

তারা যদি মনে করত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো সহযোগিতায় কুরআন রচনা করেছেন, তবে তাদের জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা গ্রহণ খুবই সহজ ছিল। ভাষাজ্ঞানে এবং অন্য কারো সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাদের মতই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো বিশেষ সুবিধা ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিল। কথার যুদ্ধের পরিবর্তে তরবারীর যুদ্ধ গ্রহণ করেছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের সর্বোচ্চ সাহিত্য ও অলঙ্কারিক মান তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার বা এর বিপরীতে কোনো সাহিত্যকর্ম পেশ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

নবুয়তের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছেন। অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে কুরআনের ছোট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় নি। কারণ তারা কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো কাব্য বা সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে। এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল। আমরা জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে। দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয় তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে। বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফির নেতৃবন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত। কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয়নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

ভবিষ্যৎবাণী

কুরআন আল্লাহর বাণী তাতে রয়েছে ভবিষ্যৎবাণীসমূহ। কুরআনের মধ্যে অনেক আগাম খবর দেওয়া হয়েছে, যেগুলি পরবর্তীকালে সঠিক সংবাদ অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। এ সকল আগাম খবরের মধ্যে রয়েছে:

(১) মহান আল্লাহ বলেছেন: “আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না।” (সূরা ফাতহ-২৭)

(২) মহান আল্লাহ বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত-ক্ষমতাধর করবেন, যেভাবে তিনি ক্ষমতা দিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে, এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ়-সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্য তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক স্থাপন করবে না...”। (সূরা নূর-৫৫)

এখানে আল্লাহ ওয়াদা করলেন মুমিনদেরকে যে, তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাধর করবেন, খলীফা বা শাসক তাদের মধ্য থেকেই হবেন, তাদের মনোনীত দীন সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের ভয়-ভীতির অবস্থা পরিবর্তন করে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা দান করেন। আবু বাকর সিদ্দীকের (রা) সময়ে এই বিজয়, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার অবয়ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। উমার ফারুকের (রা) সময়ে তা আরো প্রসারিত হয়। উসমান ইবনু আফ্ফানের (রা) সময়ে ক্ষমতা ও নিরাপত্তার চাঁদর আরো প্রসারিত হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যে মুসলিমগণ তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র প্রায় পুরোটুকুই অধিকার করেন। এভাবে আল্লাহর মনোনীত দীন এ সকল দেশের সকল দীনের উপর বিজয় লাভ করে। ফলে মুসলিমগণ নিরাপদে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন।

(৩) মহান আল্লাহ বলেছেন:

سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ

“অচিরেই তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পন করে” (সূরা ফাতহ-১৬)

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছে।

(৪) মহান আল্লাহ বলেন: “যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।” (সূরা নাসর-১-২)

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই ওয়াদাও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করেছে।

(৫) আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।” (সূরা মায়দা-৬৭)

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। অগণিত মানুষ তাঁকে হত্যা করার ও তাঁকে ধরার বুক থেকে মুছে দেওয়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেউই তার ক্ষতি করতে সক্ষম হয় নি। তিনি আল্লাহর হেফাজতে থেকে পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে পৃথিবীর আবাসস্থল পরিত্যাগ করে পরকালীন মহান আবাসস্থলে গমন করেন।

(৬) আল্লাহ বলেন: “আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী) পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী অঞ্চলে (আরব দেশের সীমানায়)। কিন্তু তারা (রোমকগণ) তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক (তিন থেকে দশ) বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এটি আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তারা অমনোযোগী।” (সূরা রুম-১-৭)

পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল অগ্নি উপাসক আর রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল খৃষ্টান। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আগে থেকেই চলছিল। ৬১৮/৬১৯ খৃষ্টাব্দের দিকে (নবুয়তের ৮/৯ম বৎসরের দিকে, হিজরতের ৩/৪ বৎসর পূর্বে) পারস্য-বাহিনীর নিকট রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কিছু সময়ের মধ্যে এই পরাজয়ের সংবাদ মক্কাতেও পৌঁছে যায়। রোমকদের উপর পারস্যবাসীদের বিজয়ের সংবাদ মক্কাতে পৌঁছালে মক্কার কাফিরগণ আনন্দিত হন। তারা বলে, তোমরা মুসলিমগণ এবং খৃষ্টানগণ ঐশ্বরিক গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবি কর। আর পারস্যবাসীগণ আমাদেরই মত কোনো কিতাব মানে না। আমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের ভ্রাতাগণের উপর বিজয় লাভ করেছেন। এভাবে আমরাও শীঘ্রই তোমাদের উপরে বিজয় লাভ করব এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়। পরাজয়ের প্রায় ৭ বৎসর পরে ৬২৭ খৃষ্টাব্দে (৬ হি:) রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পারস্য সম্রাটের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে পুরো এলাকা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

(৭) মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব।” (সূরা হিজর-৯) এভাবে আল্লাহ কুরআন নাযিলের শুরুতেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিনি এই কুরআনকে সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে সংরক্ষণ করবেন। আর বাস্তবেও তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের সকল পন্ডিত তা জানেন। এ মহান নেয়ামতের জন্য প্রশংসা মহান আল্লাহর।

অতীতের সংবাদ

কুরআন আল্লাহর অলৌকিক বাণী, তা হলো কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ববর্তী জাতি সমূহের সংবাদাদি। কুরআনে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের বিভিন্ন সংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা সর্বজন পরিজ্ঞাত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো লেখাপড়া করেন নি। আলিমদের সাথে উঠাবসা বা জ্ঞানীদের থেকে শিক্ষালাভ করার সুযোগও তার হয় নি। বরং তিনি এমন একটি জাতির মধ্যে বেড়ে উঠেন, যে জাতি মূর্তিপূজা করত এবং লেখাপড়া জানত না। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেও তারা দূরে ছিল। তিনি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য তার নিজ জাতিকে ছেড়ে দূরে গমন করেননি, যে সময়ে তিনি অন্য দেশের পন্ডিতদের থেকে এ সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারেন। এরূপ একজন মানুষ কর্তৃক পূর্ববর্তী জাতি, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য প্রদান করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমেই তিনি তা লাভ করেন।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূর্ববর্তী জাতি বা ঘটনাসমূহের সংবাদ দানের ক্ষেত্রে কুরআনে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিষয়ের বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি যদি তার তথ্য সংগ্রহে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত গালগল্পের উপর নির্ভর করতেন, তবে এ সকল বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করতেন না। খৃষ্টের ত্রুসেবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কুরআন প্রচলিত বাইবেলের বিরোধিতা করেছে। এ বিরোধিতা ইচ্ছাকৃত। কারণ প্রচলিত বাইবেলের এ সকল পুস্তক বিশুদ্ধ নয়, অথবা তা ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। কুরআনের বাণীই প্রমাণ করে যে, কুরআন ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ভুলভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তা করেছে।

মুনাফিকদের গোপন খবর

কুরআনের অলৌকিকত্বের বিষয় হলো, কুরআনে মুনাফিকদের গোপন চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। তারা গোপনে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি আঁটতো। আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যথাসময়ে একের পর এক সে সকল গোপন ষড়যন্ত্র ও সলাপরামর্শের কথা জানিয়ে দিতেন। প্রত্যেক ঘটনায় বিস্তারিতভাবে তাদের কথাবার্তা, পরিকল্পনা ও কর্মের কথা জানানো হয়েছে। প্রত্যেক বারেই তা সত্য বলে পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে ইয়াহুদীদের অবস্থা, তাদের মনের কথা ও ষড়যন্ত্রও কুরআনে বিবৃত করা হয়েছে।

বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিমুক্তি

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে হত, তবে এর মধ্যে বহু অসংগতি পেত। (সূরা নিসা : ৮২)

কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আল্লাহর বাণী হওয়ার (উদাহরণ) প্রমাণ স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য থেকে বিমুক্তি। কুরআন একটি বৃহৎ গ্রন্থ যাতে অনেক জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত, একবারে তা প্রদত্ত হয়নি; বরং সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন উপলক্ষে ও পরিস্থিতিতে এর বিভিন্ন অংশ অবতরণ করা হয় এবং বিভিন্ন সূরার মধ্যে সংযুক্ত হয়। এরূপ একটি গ্রন্থ যদি আল্লাহর বাণী না হয়ে কোনো মানুষের রচিত হতো, তবে নিঃসন্দেহে তাতে বিভিন্ন স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য দেখা যেত। সুদীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ এরূপ একটি বৃহদাকার গ্রন্থ বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। কুরআনে এরূপ স্ববিরোধিতা, বৈপরীত্য ও অসংগতি না থাকা প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহর বাণী।

হৃদয়ঙ্গম ও মুখস্ত করা সহজ

কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক হলো, শিক্ষার্থীর জন্য তা অতি সহজ হয়ে যায়। সহজেই তা মুখস্ত করা যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

“কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?” (সূরা ক্বমার-১৭)

এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও অল্প সময়ের মধ্যে সহজেই এ বৃহৎ গ্রন্থটি মুখস্ত করে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে সকল যুগে, এবং বর্তমান যুগে প্রতিটি মুসলিম সমাজ বা জনপদে অগণিত হাফিযে কুরআন বিদ্যমান, যারা পূর্ণ কুরআন মুখস্ত রেখেছেন। যাদের যে কোনো একজনের স্মৃতির উপর নির্ভর করে কুরআনুল কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশুদ্ধভাবে লিখে নেওয়া যায়। শব্দের পরিবর্তন বা ভুল তো দূরের কথা, স্বরচিহ্ন, বিভক্তিচিহ্ন বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি হারাকাতেও সামান্যতম ভুল হবে না।

পক্ষান্তরে বিশ্বের কোথাও একজন খৃষ্টানও পাওয়া যাবে না যিনি পুরো বাইবেল মুখস্ত রেখেছেন। পুরো বাইবেল বা পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল পুস্তক মুখস্ত করা তো অনেক দূরের কথা, শুধু নতুন নিয়ম বা সুসমাচারগুলি মুখস্ত করেছেন এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না। এটি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ ও ইসলামের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একটি সহজবোধগম্য পার্থক্য ও কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের প্রমাণ, যে কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষও তা অনুভব করতে পারেন।

একবচন الملك বহুবচন الملائكة [আল-মালাঈকা] অর্থ. (Angels) ফেরেশতা।

পরিবারিক সংগা: আল্লাহর হুকুমে ফেরেশতারা বিভিন্ন আকার ও রূপ ধারণ করতে পারেন। মানুষের মতো রক্ত-মাংসের সৃষ্টি না হওয়ায়, তাদের কামনা-বাসনা, পানাহারের প্রয়োজনীয়তা ও ঘুম-বিশ্রাম কিছুই নেই।

ঈমান বিল-গাইব (الإيمان بالغيب) তথা না দেখা বিষয়সমূহের ওপর ঈমানের এর অন্তর্ভুক্ত হলো: ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করা। এটি ঈমানের অন্যতম রুকন। ফেরেশতাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউ জানে না।

ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে:

১. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন-সুন্নাহে নাম জানা ফেরেশতা যেমন জিবরীল আ. তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। এবং যাদের নাম জানিনা তাঁদের প্রতি মুজমাল তথা সংক্ষিপ্তাকারে ঈমান রাখা।

২. ফেরেশতাগণের যে গুণসমূহ আমরা জানি তা বিশ্বাস করা।

৩. আমাদের জানা মতে আল্লাহর আদেশে তাঁরা যে সকল কাজ করেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখা। যেমন: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা, ক্লাস্তি ও অবসাদ ছাড়া দিন রাত্রি তাঁর ইবাদাত করা।

১. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা:

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণেই ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আল কোরআন ও মুসলমানদের ঐকমত অনুযায়ী কুফরী। আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
عُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

‘রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা বাকারা, আয়াত -২৮৫)

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং শেষ দ্বীনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে। (সূরা নিসা-১৩৬)

তাঁরাও আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি-মাখলুক এবং আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাঁদেরকে যা আদেশ করেন অবাধ্য না হয়ে তাঁরা তা সাথে সাথে পালন করেন।
আল্লাহ তায়ালা বলেন:

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ

বরং ফেরেশতাগণ তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারেন না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করেন। (সূরা আশ্বিয়া-২৬, ২৭)

খ- ফেরেশতাগণের গুণাবলী

সৃষ্টিগত গুণের মধ্যে রয়েছে যা আল্লাহর রাসূল (সা.) উল্লেখ করেছেন: তাঁরা নূরের তৈরী, রাসূল (সা.) বলেছেন:

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ

ফেরেশতাগণকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সহিহ মুসলিম-২৯৯৬)

আল্লাহ তায়ালা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন সংখ্যক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টি মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম। (সূরা ফাতির -১)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল আ.কে ছয়শত পাখাসহ দেখেছেন। আল্লাহর শক্তিতে ফেরেশতাগণ কখনো মানুষের রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকেন। যেমন, মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) এর নিকটে আল্লাহ তায়ালা জিবরীল আ. কে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) ও লুত্ব আল্লাইহিমাস সালামের নিকটে ফেরেশতাগণকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন।

ফেরেশতাগণ অদৃশ্য জগত (তাদেরকে দেখা যায় না) তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর ইবাদাত করেন। পালনকর্তা বা মা'বুদ হওয়ার কোন যোগ্যতা তাঁদের মাঝে নেই। বরং তাঁরাই আল্লাহর বান্দা এবং সর্বদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করছেন যেমন আল্লাহ বলেন:

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

তারা (ফেরেশতাগণ) আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করেন। (সূরা তাহরীম-৬)

গ- ফেরেশতাগণের প্রকার ও কাজ

কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার মাখলুকের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পাহাড়ের দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। সে শুক্র বিন্দু থেকে শুরু করে শিশুর গঠন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে। বান্দা যেই আমল করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মহা শূন্যের গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। তারা তা ঘুরান ও পরিচালনা করেন। চন্দ্র-সূর্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন জ্বালানো, জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়া এবং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। জান্নাত, জান্নাতের পরিচালনা, তাতে বৃক্ষাদি লাগানো এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত স্থাপন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং ফেরেশতার আলাহর সর্বাধিক বড় সৈনিক। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, জিবরীল আ. তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর রাসূলগণের নিকটে ওহী নিয়ে আসার দায়িত্বপ্রাপ্ত। বৃষ্টি ও তা পরিচালনার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মীকাঈল আ. সিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা হলেন ইসরাফীল আ.আত্মাসমূহ কবজ করার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মালাকুল মাওত হযরত আজরাঈল আ. ও তাঁর সহযোগী ফেরেশতাগণ। কিরামান কাতেবীন: যারা মানুষের কর্মের হিসাব রাখেন, ডান দিকের ফেরেশতাগণ ভালো কাজের আর বাম দিকের ফেরেশতাগণ খারাপ কাজের হিসাব রাখেন।